



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 615 - 621

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

সাম্প্রতিককালে প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও নৈতিকতার প্রাসঙ্গিকতা

সুতপা মন্ডল

সহযোগী অধ্যাপিকা

গভর্ণমেন্ট জেনারেল ডিগ্রী কলেজ, সিন্ধুর

Email ID : sutapamondal7278@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Ancient,
caturvarna,
dharma, duties,
morality,
religion, rita.

Abstract

In Indian tradition religion and morality are interrelated. Religion or dharma means not only the institutional religion but also moral duties and obligations in ancient Indian ethical thoughts. The word 'Religion' derived from the Latin word 'Religare' which means that bounds together. 'Dharma' means that holds everything inside it. Dharma includes morality, duties, self-restrains, good conduct etc. Morality is equal to duties, good conduct, rules etc. So, religion and morality are the two sides of a same coin. Morality was considered as a law regarding the material and the ethical life in ancient Indian tradition. That very law is called 'Rita'. This is an indispensable law which regulates everything in this cosmos. 'Rita' unifies everything as religion does. Caturvarna was established by the intrinsic nature or characteristic of people at that time. The efficient women were also respected by everyone at that time. But from the time of Sage Manu, the definition of Caturvarna had been changed. Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra—the difference among these four classes began to clear from that time and till now it is continuing. A new disease has been broken out in Indian society and that is fanaticism. India is a country of unity in diversity from the remote past. But today the people of different religions and castes want to eradicate this unity by their rigid misconception and fanatic views. As a result, everyone suffers from violence and alienation. If we would like to bring back the peace, unity among people we have to remember the path shown by our Vedic seers. We have to spread love and to be compassionate. We have to recollect that we all are the creation of the same divine being, Brahman. We all are relatives. There is no difference among us. We all have the one identity that we are human being. If this truth will be accepted by everyone then everyone will be united and the great peace will be prevailed in this world. Here is the significance of dharma or religion and morality which assimilate everything.

Discussion

ধর্ম হল ‘বৃদ্ধি ও বিকাশ’। সেন্ট অ্যানসেলমের এই সংজ্ঞার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় ধর্মের ব্যাপকতা। এই ব্যাপকতা এতটাই যে মনুষ্য সৃষ্টির আদিদগ্ন থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত ধর্মের যে এত বিবর্তন তা বোধ করি অন্যকিছুর ঘটেনি। সৃষ্টির সূচনা পর্বে ধর্ম সম্পর্কে মানুষ অবহিত ছিল না, প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য মানুষ কোন এক রহস্যময় অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস পোষণ করে তাকে উপাসনা করত, যা ধীরে ধীরে ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করে। আদিম মানুষের এই বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে যেমন বৃক্ষ, নদী, পাথর, প্রাণী, প্রেতাভা, ফেটিশ, টোটেম উপাসনা থেকে শুরু করে আধুনিককালের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীস্টান, মুসলীম ইত্যাদি ধর্মের উদ্ভব হয়েছে। অর্থাৎ ধর্ম হল এক প্রবহমান বিষয় যা কখনও স্থানু হয়ে থাকেনি তাই ধর্মের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা দেওয়া এক দুরূহ ব্যাপার।

ধর্ম অতি দুরূহ বিষয়। ধর্মের পথও অতি দুর্গম। ধর্ম নানা বিষয়কে নিজের মধ্যে আশ্রয় করে রাখে। সেখানে একদিকে যেমন কর্তব্য রয়েছে, অপরদিকে অকর্তব্য। অহিংসা বা ক্ষমা যেখানে পরম ধর্ম, যুদ্ধ করা (ক্ষাত্রধর্ম) বা প্রাণ নাশ করাও ধর্মরূপে বিবেচিত হয়। সত্য কথা বলা বা প্রতিজ্ঞা রক্ষাই যেখানে ধর্মের স্বরূপ, কারোর প্রাণ রক্ষা করতে মিথ্যা কথা বলাকেও ধর্মরূপে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় স্বীকৃতি দিয়েছেন। ধর্মের মধ্যে একটি আপাত স্ব-বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। এই আপাত স্ব-বিরোধিতা দূরীকরণে যুধিষ্ঠির প্রদত্ত ধর্মের লক্ষণ গ্রহণ করা যেতে পারে। মহাভারতের বনপর্বে বক্রপী ধর্মরাজের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেন –

“ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহ্যাম্

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ”ⁱⁱⁱ

অর্থাৎ ধর্মের তত্ত্ব অতি দুরূহ এবং গুহার অভ্যন্তরে নিহিত, মহাজনেরা যে পথ অবলম্বন করেছেন সেই পথই সকলের অনুসরণীয়। এখানে ‘মহাজন’ শব্দের অর্থ হল বহুজন। তাহলে বলতে হয় বহু মানুষ যে ধর্মের পথে গমন করেন সে পথই ধর্মের পথ। কিন্তু বহু মানুষের পথ সাম্প্রদায়িক ধর্মকেও ইঙ্গিত করছে। তাই বিমলকৃষ্ণ মতিলাল বাবুর মতানুসরণ করে বলতে হয় “মহাজনো যেন (হিতং) গতঃ স পন্থাঃ”ⁱⁱⁱ, অর্থাৎ বহুজনে যে পথে গমন করেছেন তা ধর্ম নয়, বহুজনের হিতসাধনের পথই হল ধর্ম। আবার, ‘ধর্ম’ শব্দটির ইংরাজী প্রতিশব্দ হল ‘Religion’ যার উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ ‘Religare’ থেকে। ‘Religare’ এর অর্থ ‘to bind together’ অর্থাৎ যা একসঙ্গে বেঁধে রাখে^{iv}। যদিও এই অর্থটির সঙ্গে পাশ্চাত্যের ধর্মের কোন সংগতি নেই। পাশ্চাত্যে ধর্ম বলতে বোঝায় এক অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় আচার পালন, ঈশ্বরের উপাসনা ইত্যাদি। কিন্তু ‘religare’ এর যা অর্থ তার সঙ্গে সংগতি লক্ষ্য করা যায় ভারতীয় দর্শন প্রদত্ত ধর্মের সংজ্ঞার সঙ্গে। ভারতীয় দর্শনে ধর্মের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ‘ধৃ’ ধাতুর সঙ্গে ‘মন্’ প্রত্যয় করে ‘ধর্ম’ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে যার অর্থ হল যা সব কিছুকে ধারণ করে রাখে।^v সুতরাং সব কিছুকে ধারণ করার অর্থ হল সমস্ত কিছুকে একসূত্রে বেঁধে ধারণ করা। এখানে সমস্ত কিছু বলতে বোঝায় জগৎ, জাগতিক শৃঙ্খলা, নৈতিকতা, বিধিনিষেধ, সদাচার ইত্যাদি।

ধর্ম বলতে যদি একসূত্রে বেঁধে রাখা বোঝায় তাহলে তা ‘ঋত’-র সঙ্গে অভিন্ন। ঋগবেদে ‘ঋত’^{vi} নামক এক জাগতিক ও নৈতিক শৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যায় দ্বারা সমস্ত নৈতিক ও জাগতিক নিয়ম রক্ষিত হয়। ভারতীয় নীতিবিদ্যায় ঋত এক অমোঘ ও অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। ঋত-র প্রভাবেই জাগতিক ও নৈতিক সর্বত্রই এক শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়, কোথাও কোন ছেদ বা ফাঁক নেই, সমস্তটাই এক বন্ধনে আবদ্ধ। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, ঋতু পরিবর্তন, জোয়ার-ভাটা ব্যতিক্রমহীন ভাবে ঘটে চলেছে। অনুরূপভাবে মানুষের নৈতিক জীবনেও ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, কর্তব্য-অকর্তব্য বোধ সকলের থাকে। গোপনে কোনো অপকর্ম করলেও ঋত-র দৃষ্টির অগোচর কিছুই থাকে না। ঋত-র জন্যই মানুষের নৈতিক জীবন শৃঙ্খলাবদ্ধ। একে পাশ্চাত্য দার্শনিক লাইবনিজের পূর্ব-নিয়ন্ত্রিত-সামঞ্জস্যবাদের সঙ্গেও তুলনা করতে পারি। লাইবনিজের মতে জগতের সর্বত্র এক পূর্ব-নিয়ন্ত্রিত-সামঞ্জস্য থাকায় আমাদের জগতের সবকিছুই শৃঙ্খলাবদ্ধ।^{vii} জগতের কোথাও কোনও ছেদ বা ফাঁক নেই। সুতরাং ধর্ম হল এক পূর্ব-নিয়ন্ত্রিত-সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অমোঘ অলঙ্ঘনীয় বিধি যার দ্বারা সমস্ত জগত ব্যবস্থা একসূত্রে গ্রথিত। ঋত-র ধারণায় যে বিশ্বনিয়ম ব্যক্ত হয়েছে তারই অনুরণন শোনা যায় লাইবনিজের

চিন্তাধারায়। ধর্মের প্রকৃতি যে আসলে সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করা তা উপনিষদের এই বানীর দ্বারা ধ্বনিত হয়েছে - “শৃঙ্খল বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা।”^{viii} অর্থাৎ মানুষ অমৃতের পুত্র, প্রাচীন ভারতের এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ পরমাত্মা ব্রহ্মের সৃষ্টি, অমৃতের পুত্র। সুতরাং সমস্ত মানুষ সমান। শঙ্করাচার্যের ভাষায়, “জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ,”^{ix} অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। পরমব্রহ্ম থেকে সমস্ত জীবাত্মার সৃষ্টি হওয়ার ফলে সকল মানুষই সমান। উচ্চ-নীচের কোন ভেদ থাকতে পারে না। অজ্ঞান বা মায়াবশতঃ জীবাত্মা এই উপলব্ধি করতে অক্ষম। অজ্ঞান বা ময়া দূরীভূত হলেই জীবাত্মা উপলব্ধি করতে পারবে মানুষে মানুষে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বশেষে কোনও ভেদাভেদ থাকতে পারে না। ধর্মের কাজ হল ঐক্যবদ্ধ করা, বিচ্ছিন্নতা নয়। বিচ্ছিন্নতা তো মানুষের সৃষ্টি। যদিও প্রাচীন ভারতের বেদ-উপনিষদ তথা বিভিন্ন দার্শনিক আলোচনায় ধর্ম বলতে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে বোঝানো হয় নি, কর্তব্য কর্ম বা মনুষ্য হৃদয়ের মধ্যে নিহিত কিছু স্বকীয় অনুভূতিকে, উপলব্ধিকে বোঝানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ধর্ম কোন নির্দিষ্ট মত নয়, একটা নিগূঢ় চেতনা এবং জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। যদি তাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি না করে কেবল আচারসর্বস্ব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মরূপে প্রচার করার চেষ্টা করা হয় তাহলে তা ক্রমশ আমাদের জীবন থেকে সরে যেতে থাকে।^x

ভারতীয় দর্শনে ধর্মকে আরও একভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ধর্ম হল চতুর্বর্গ পুরুষার্থের অন্যতম। ধর্ম বলতে এখানে কর্তব্য কর্ম বোঝানো হয়, শাস্ত্রসম্মত আচরণবিধি। এই শাস্ত্রসম্মত আচরণ বিধির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বর্ণাশ্রম ধর্ম (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, ও সন্ন্যাস) ও কর্তব্যকর্ম অর্থাৎ যেকোনো প্রকার সং কর্ম ও নীতিভিত্তিক কর্ম, যেমন- সং কর্ম করা, অহিংসা ব্রত পালন করা, দয়া ও ক্ষমাশীল হওয়া ইত্যাদি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় নীতিদর্শনে ধর্ম বলতে তথাকথিত কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে বোঝানো হয় নি, বোঝানো হয়েছে নীতি, কর্তব্য ও শৃঙ্খলাকে।

তবে বর্তমানে যেভাবে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গভেদে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা হয় বা হচ্ছে প্রাচীন ভারতে এভাবে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা হত না। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে “চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ,”^{xi} যেখানে গুণ ও কর্মসামর্থ্যের নিরিখে মানুষকে বিভিন্ন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, মানুষের জন্মের ভিত্তিতে নয়। অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ অনুসারে মানুষ নিজ নিজ কর্মে ব্যাপ্ত থাকবে সেখানে জন্ম পরিচয় নগন্য। সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণের কর্ম হল অধ্যাপনা, অল্পসত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট রজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়ের কর্ম হল যুদ্ধ, অল্পতমঃগুণবিশিষ্ট রজঃপ্রধান বৈশ্যের কর্ম হল কৃষি ও বানিজ্য এবং তমঃপ্রধান শূদ্রের কর্ম হল অন্য তিন বর্ণের সেবা। তবে ভাগবদগীতা অনুসারে ব্রাহ্মণ পুত্র হলেই তাকে ব্রাহ্মণ হতে হবে এমন নয়। সত্ত্বগুণপ্রধান স্বভাব হলে শূদ্রের পুত্রও ব্রাহ্মণ হবে এবং তমঃগুণপ্রধান স্বভাব হলে ব্রাহ্মণ পুত্রও শূদ্র হবে। উদাহরণস্বরূপ একজন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেও যদি ক্ষত্রিয়ের ন্যায় তেজস্বী ও বলশালী হন তাহলে তিনি অবশ্যই একজন ক্ষত্রিয়রূপে গন্য হবেন। আবার, কোন ব্যক্তি শূদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেও যদি ব্রাহ্মণের ন্যায় জ্ঞানী ও সদাচারী হন তাহলে তিনি অবশ্যই একজন ব্রাহ্মণের মর্যাদা অধিকার করবেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জন্ম ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে নেই কিন্তু তার কর্ম তার নিয়ন্ত্রণে এবং এই কর্মের দ্বারাই মানুষের পরিচয় গড়ে ওঠে।

প্রাচীন ভারতে এই প্রকার নানান দৃষ্টান্ত বর্তমান যেখানে দেখা যায় যে নীচু বংশে জন্মগ্রহণ করেও ব্যক্তি তার নিজ কর্মগুণে অসাধারণ কীর্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ - “জবালা-সত্যকাম-উপাখ্যান” এর সত্যকামের কথা উল্লেখ করা যায়।^{xii} সত্যকাম জবালা নামক এক রমনীর পুত্র ছিলেন এবং সংসার কর্মে ব্যাপ্ত থাকায় জবালা স্বামীর পরিবারের কুল বা গোত্র সম্বন্ধে জানার অবকাশ পান নি তাই সত্যকামকেও তা অবগত করাতে পারেন নি। একথা সত্যকাম সর্বসমক্ষে স্বীকার করায় গৌতম মুনি তাঁকে আলিঙ্গন করে শিষ্যত্ব প্রদান করেন এবং সত্যকামকে তার সং সাহস ও সত্যবাদীতার জন্য ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূতরূপে ঘোষণা করেন। মহাভারতের মহাবীর কর্ণ একজন সারথীর পুত্র হয়েও (যদিও তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন তথাপি তা সকলের অজানা ছিল) নিজের শৌর্য ও বীরত্ব বশতঃ একজন মহাপরাক্রমশালী ধনুর্ধর ছিলেন এবং অঙ্গরাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন। মহাভারতের অপর এক চরিত্র একলব্য একজন অরণ্যবাসী হয়েও অর্জুনের মত মহা ধনুর্ধর হওয়ার দাবী রাখতেন কিন্তু তাঁর সে আশালতা গুরুত্বের নিম্নলব্ধ করা হয়েছিল অর্জুনের স্বার্থে। সর্বোপরি রামায়ণ ও মহাভারতের রচয়িতাগণ যথাক্রমে বাণ্মীকি ও বেদব্যাস কোন উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করেন নি। মহর্ষি বাণ্মীকিপ্রথম জীবনে দস্যু রত্নাকর ছিলেন (বিভিন্ন প্রাদেশিক রামায়ণের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী)^{xiii} কিন্তু পরবর্তীকালে গভীর

তপস্যার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করে তিনি রামায়ণের প্রণেতা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। পুনরায়, মহাভারত প্রণেতা মহর্ষি বেদব্যাসের পিতা ছিলেন পরাশর মুনি এবং তাঁর মাতা ছিলেন ধীবর কন্যা মৎস্যগন্ধা পরবর্তীকালে যিনি হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনুর দ্বিতীয়া স্ত্রী সত্যবতী নামে পরিচিত হন। মহর্ষি বেদব্যাস ছিলেন সত্যবতীর কানীন পুত্র।^{xiv} কিন্তু মহাভারতের প্রণেতা হিসাবে তিনি জগদ্বিখ্যাত। সুতরাং মানুষ কোন বংশে তথা কোন বর্ণে জন্ম গ্রহণ করেছে তা নগন্য বিষয় আসলে তার পরিচয় তার কর্মে। এই কর্মই হল তার আসল ধর্ম।

শ্রীকৃষ্ণের উক্ত চিন্তাধারার সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় অস্তিবাদী দর্শনের। অস্তিবাদ অনুযায়ী, জন্ম ব্যক্তির হাতে নেই কিন্তু জন্মের পরবর্তী সময় থেকে তার নিজের সমস্ত কিছু জন্ম দায়ী হল ব্যক্তি। অস্তিবাদ আসলে পাশ্চাত্য দর্শনের চিরাচরিত জ্ঞানতাত্ত্বিক ও আধিবিদ্যক আলোচনার বাইরে গিয়ে ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বকে অনুসন্ধান করা। তাত্ত্বিক আলোচনার বাইরেও ব্যক্তির যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে অস্তিবাদ সেটাই প্রতিপন্ন করে। অস্তিবাদের উৎপত্তি হয়েছে ডেনমার্কের দার্শনিক সোরেন কিয়ের্কোর হাত ধরে।^{xv} ব্যক্তি যে একজন স্বতন্ত্র সত্তা, তার নিজস্ব কিছু পছন্দ-অপছন্দ, মতামত, সর্বোপরি অস্তিত্ব রয়েছে এটাই অস্তিবাদের গোড়ার কথা। অস্তিবাদ অনুযায়ী ব্যক্তি প্রতিটি ক্ষণে নিজের অভিজ্ঞতা ও নিজেকে অতিক্রমণ করা নিয়ে বেঁচে থাকে। তার অস্তিত্ব এবং ব্যক্তি রূপে আত্মপ্রকাশকে অস্তিবাদে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বক্তি উচ্চবর্ণ না নিম্নবর্ণ, স্ত্রী না পুরুষ সেটা তার আসল পরিচয় নয়। সে যে একজন ব্যক্তি মানুষ এবং তার অস্তিত্বই তাকে অন্য সব কিছুর তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। এমনকি, সে কোন পেশা নির্বাচন করবে সেটাও তার নিজস্ব পছন্দের ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে। কোন সমাজ বা সম্প্রদায় বলপূর্বক তার উপর নিজেদের মতামত আরোপ করতে পারে না, তাহলে ব্যক্তির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং ধর্মের নামে বর্ণভেদ তথা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ কেবল ধর্মের মত একটি মহান আদর্শকেই অধোগামী করে না, ব্যক্তির অস্তিত্বকেও অস্বীকার করে।

ধর্ম ও ঈশ্বর প্রসঙ্গে অস্তিবাদী কিয়ের্কোর এক অভিনব মতামত পোষন করেছিলেন। তিনি প্রচলিত খ্রীস্টধর্ম ও ঈশ্বরকে অতিক্রম করে নতুন আঙ্গিকে ঈশ্বরের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। মানব অস্তিত্বের ক্রমবিকাশের যে তিনটি স্তরের কথা তিনি বলেছেন সেগুলি হল- নান্দনিক স্তর, নৈতিক স্তর ও আধ্যাত্মিক স্তর। এর মধ্যে আধ্যাত্মিক স্তরে তিনি ঈশ্বর সম্পর্কিত তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে ঈশ্বর হল ব্যক্তি মনের যন্ত্রণা, ভীতি, অনুতাপ, পাপবোধের সম্মুখীন হয়ে এগুলি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য এক অলঙ্ঘনীয় সত্তার প্রতি আস্থা পোষণ।^{xvi} আর তা থেকেই ধর্মের প্রতি আস্থাশীল হওয়া। এ যেন ব্যক্তির অন্তরের নিজস্ব কোন কামনার পরিতৃপ্তি, এক পরম অনুভূতি। রবীন্দ্রনাথও ধর্মকে অন্তরের অনুভূতি মনে করেছেন, যাকে শুধু উপলব্ধি করা যায়। কোনও বাহ্যিক আরোপণ সেখানে অসার।

কিন্তু সমস্যা শুরু হয় যখন চতুর্বর্ণের অপর এক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় মনু সংহিতায়। আর তার থেকেই মানুষে মানুষে প্রভেদ শুরু হয়। এই ব্যাখ্যা অনুসারে প্রজাপতির মুখ থেকে ব্রাহ্মণের, বাহুদয় থেকে ক্ষত্রিয়ের, উরুদয় থেকে বৈশ্যের এবং পা থেকে শূদ্রের উৎপত্তি হয়েছে। এই উৎপত্তি ক্রম অনুসারেই তাদের কর্ম নির্ধারিত হয়েছে। ব্রাহ্মণের কর্ম অধ্যাপনা, ক্ষত্রিয়ের কর্ম যুদ্ধ করা, বৈশ্যের কর্ম ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শূদ্রের কাজ অপর তিন শ্রেণীর সেবা করা। এই মতানুসারে ব্যক্তির গুণধর্ম অনুসারে তার বর্ণ নির্ধারিত হয় না, তা নির্ধারিত হয় কোন বংশে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার কর্ম নির্ধারিত হয় বংশ পরম্পরায়।^{xvii} এরফলেই মানুষে মানুষে প্রভেদ খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠে সমাজের সবচেয়ে প্রভাবশালী সম্প্রদায় আর শূদ্র সবচেয়ে নিকৃষ্ট। ফলতঃ শূদ্র শ্রেণীর অবস্থান সমাজে সর্বনিম্ন স্তরে হওয়ায়, কোনও শূদ্র সত্ত্ব গুণাধিকারী হলেও তাকে শূদ্র হিসাবেই গণ্য করা হত। এভাবেই চতুর্বর্ণ প্রথা ক্রমে বর্ণভেদ ও পরবর্তীকালে জাতিভেদ প্রথায় পর্যবসিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, মনু প্রবর্তিত চতুর্বর্ণ গীতোক্ত চতুর্বর্ণের ন্যায় উদার নয়।

তবে ধর্মকে যদি ‘সদাচার’ অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে মনু সংহিতাতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মনু সংহিতায় ধর্মের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে -

“বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ”^{xviii}

অর্থাৎ, বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও শাস্ত্রোক্ত বিষয়গুলি সম্পাদন করে যে প্রীতি বা আত্মতুষ্টি হয় তাকেই ধর্ম বলা হয়। এখানে ‘সদাচার’ শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যেসব ব্যক্তি সংস্কারের বেড়াজাল মুক্ত হয়ে যুক্তির দ্বারা সৎ কর্মকেই ধর্মরূপে বিচার করেন সেটাই আসল ধর্ম। এখানে ধর্ম নৈতিকতার সঙ্গে তুলনীয়।

তবে বর্তমানে ধর্ম তার কৌলিন্য, ঔদার্য হারিয়ে ক্রমশ সংকীর্ণ আচার সর্বস্ব সাম্প্রদায়িক ধর্মে পরিণত হচ্ছে। এই ধর্ম সমস্ত কিছুই আধার নয়। এই ধর্ম শুধু মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নিয়ে আসে, আর নিয়ে আসে হানাহানি, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। বর্তমানের ধর্ম ভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে তো বটেই, এমনকি স্বধর্মের মানুষের মধ্যেও বিভেদ ডেকে আনে। এ ধর্ম মানব ধর্ম হতে পারে না যে মানব ধর্মের কথা রবীন্দ্র নাথ বলেছেন। এমনকি তিনি নিজেও মানুষের অন্তরের ধর্মের সঙ্গে সমাজে প্রচলিত ধর্মের মিল খুঁজে পান নি। তাঁর আক্ষেপ তাঁর বিভিন্ন রচনায়, বিভিন্ন কবিতায় স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান –

“যে ধর্ম সেবারূপে, প্রেমরূপে, করুণারূপে, আত্মত্যাগরূপে এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধারূপে সকলকে শক্তি দেয়, প্রাণ দেয়, কল্যাণ দেয়, কোথাও তাকে দেখা যায় না।”^{xix}

ধর্ম ও ধর্মের ঈশ্বরকে লাভ করতে গিয়ে মানুষ আচারসর্বস্ব রীতিনীতি ও ধর্মোন্মত্ততায় মেতে উঠেছে। ঈশ্বরকে আরাধনা করার পরিবর্তে কিছু কুসংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ রীতিনীতির আরাধনায় মানুষ ব্যাপ্ত, আর ধর্ম ও ঈশ্বর সেখানে বিস্মৃত। স্বর্ণ প্রাচীরের দেবালয় থেকে ঈশ্বর যে কখন বিদায় নিয়েছেন সে সম্পর্কে মানুষের চৈতন্য নেই-

“তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি
বুঝতে নারি কখন তুমি দাও যে ফাঁকি”^{xx}

সুতরাং ধর্ম অন্তরের উপলব্ধির বিষয়, তাকে সংকীর্ণতার বেড়াজালে আবদ্ধ রেখে মানুষে মানুষে প্রভেদ করলে ধর্ম মানুষকে শুধুই নিম্নগামী করে, মানব ধর্ম হয়ে পড়ে কলুষিত।

এবার আসা যাক নৈতিকতার প্রসঙ্গে। নৈতিকতা আসলে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের একটি গুণ বা ধর্ম। এই গুণ বা ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নীতিবিদ্যায়, যেখানে সাধারণভাবে বলা হয় যে নীতিবিদ্যা হল সেই শাস্ত্র যেখানে মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্মের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি বিচার করা হয়। এককথায় বলায় যায় নীতিবিদ্যা, যেখানে মানুষের নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়, আসলে মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় শাস্ত্র। “নৈতিকতা” শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ ‘morality’ টির অন্তর্গত ‘moral’ শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ ‘mores’ থেকে, যার অর্থ রীতি-নীতি।^{xxi} এই রীতি-নীতি আসলে সদাচার ও মূল্যবোধকেই নির্দেশ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে নৈতিকতা আসলে সদাচারেরই নামান্তর। আবার ধর্মের এক অর্থ হল সদাচার। তাহলে ধর্ম ও নৈতিকতা দুটো বন্ধনে আবদ্ধ। ধর্ম থেকে নৈতিকতাকে পৃথক করা সমীচীন নয়। ধর্ম এবং নৈতিকতার আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে ধর্ম ও নৈতিকতা আসলে একই মুদ্রার দুটি দিক। ধর্মের যেমন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা সম্ভব নয়, সেরকমই নৈতিকতারও সংজ্ঞা প্রসঙ্গে নীতিবিদেরা একমত পোষণ করেন না। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট নৈতিকতা বলতে বুঝেছেন শর্তহীন অনুজ্ঞা, অর্থাৎ ব্যক্তির কর্ম হবে শর্তহীন, কোন কিছু ফেরৎ পাবার আশায় ব্যক্তি নৈতিক কর্ম করবে না। ব্যক্তি কর্ম করবে নিছক কর্তব্যের জন্য। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কোন অনুভূতি, কোন সম্পর্ক বা আবেগের বশবর্তী হবে না। এ যেন সেই গীতায় বর্ণিত নিষ্কাম কর্মের সমতুল। নিষ্কাম কর্মে বলা হয়েছে -

“কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্তা তে সঙ্গোবস্তুকর্মণি।”^{xxii}

অর্থাৎ কর্ম কর, কর্ম ফলের আশা করো না। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জনপূর্বক কর্ম সাধনই হল নিষ্কাম কর্ম তথা কান্টের শর্তহীন অনুজ্ঞা। তবে কান্ট কোন ঈশ্বরের কাছে সমস্ত কর্ম সমর্পনের কথা বলেননি, কিন্তু শ্রী কৃষ্ণ বলেছেন সমস্ত কর্তৃত্বাভিমান ভুলে সমস্ত কর্ম তাঁর চরণে নিবেদন করতে। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এটুকুই। আর এই কর্তব্য-কর্মকে শর্তহীন অনুজ্ঞা বা

নিষ্কাম কর্ম যাই বলা হক না কেন, আসলে তা সদাচার। আর সদাচার বলতে আমরা ধর্মকে বুঝি। সুতরাং ধর্মকে নৈতিকতার সঙ্গে অভিন্ন বলা যেতে পারে।

ভারতীয় ধ্যান-ধারণায় প্রাচীনকাল থেকেই ধর্ম ও নৈতিকতা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এটুকু সহজেই অনুধাবন করা যায় ব্যক্তিকে নৈতিক হতে হলে তাকে ধার্মিক হতে হবে আর ধার্মিক হতে গেলে নৈতিকতাকে ব্যক্তি বিসর্জন দিতে পারবে না। এই নৈতিকতা এক প্রকার মানব ধর্ম। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-স্ত্রী-পুরুষ-ধনী-নির্ধন-নির্বিশেষে সকলের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য কর্ম। প্রাচীন ভারতের এই মানব ধর্ম যে সকলকে একসূত্রে বেঁধে রাখে সে সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তবে আরো একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয় হল প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারায় ধর্ম তথা নৈতিকতা থেকে নারীকে ব্রাত্য রাখা হয় নি। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীকে বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। মনু বলেছেন, -

“যে বংশে স্ত্রী জাতি পূজিত হন, সেখানে দেবতারাও প্রসন্ন হন।”^{xxiii}

এছাড়া তিনি বলেছেন যেসব নারী নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ তারাই সমাগভাবে সুরক্ষিত - “আত্মানমাত্মানা যাস্তু রক্ষ্যন্তাঃ সুরক্ষিতাঃ।”^{xxiv} এই শ্লোকটির দ্বারা নারীশক্তির একটি দিক উন্মোচিত হয়েছে এবং তারা যে আত্মনির্ভর হতে পারে এটা বোধহয় তারই ইঙ্গিত। এছাড়াও আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদের সেই বিদূষী ও দুঃসাহসী বৈদিক নারী গার্গী সম্বন্ধে অবগত হই যিনি ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনায় পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকে যুক্তি-তর্কে জর্জরিত করেছিলেন।^{xxv} যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রী সংবাদে মৈত্রী অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রীর সম্বন্ধে জানা যায়, তিনিও একজন বিদূষী নারী ছিলেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের কাছ থেকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে চেয়েছিলেন।^{xxvi} তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একজন নারীও তাই মানুষ হিসাবে নিজের পরিচয় গড়ে তুলতে সক্ষম। সুতরাং নারী ও পুরুষ এই ভেদাভেদও সমীচীন নয়। বর্তমানে নারী সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করেছে।

নিবন্ধটির অন্তিম পর্যায়ে এসে দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র আলোচনা থেকে ভারতীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তাতে একটি বিষয় খুব স্পষ্ট যে সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সাম্য ও ঐক্যের নীতিতে বিশ্বাসী, যেখানে মানুষের কর্মই তার অস্তিত্বের পরিচায়ক, তার জন্ম, বংশমর্যাদা, লিঙ্গ ইত্যাদি নয়। আর নৈতিকতার কণ্ঠিপাথরে যাচাইকৃত কর্মই হল সদাচার তথা ধর্ম। এ ধর্ম কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম নয়, মানবধর্ম।

তবে বর্তমান ভারতের চিত্র কিছুটা অন্যরকম। বর্তমানে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি থেকে শুরু করে সর্বত্র ধর্মবিদ্বেষ, জাতিভেদ, বর্ণবিদ্বেষ, লিঙ্গবৈষম্য এক সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। হিন্দু-মুসলীম-খ্রীষ্টান-বৌদ্ধ-জৈন এই ভেদাভেদ আজ ভীষণভাবে স্পষ্ট। কারও কর্ম আজ আর তার পরিচয় বহন করে না। সাম্প্রদায়িক ধর্মই আজ মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মানবিকতা নয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ সবই আজ বিস্মৃতপ্রায়। সর্বত্র আজ ধর্মাত্মক ব্যক্তিদের ভিড়। উচ্চ-নীচের প্রভেদ খুব স্পষ্ট আজ। সংবিধান প্রণেতা আম্বেদকরের মতে সমাজ থেকে উচ্চ-নীচের বিভেদ ঘুঁচে না গেলে, চীরকালের বঞ্চিত, অবহেলিত নিম্নশ্রেণীর মানুষ যখন আলোকপ্রাপ্ত হবে তখন নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তারা নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। এভাবে চলতে থাকলে সেই সঙ্কটময় পরিস্থিতির আর বেশি দেরি নেই যখন ভারতবর্ষ এক স্বজনবিরোধী রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।^{xxvii} তাই আজ সময় এসেছে ভারতবর্ষের প্রাচীন আদর্শকে পুনঃস্মরণ করার, প্রয়োজন পড়েছে পুনর্বীর বৈদিক মূল্যবোধকে অনুসরণ করার। শুধুমাত্র আদর্শ অনুসরণ করলেই চলবে না, সেই আদর্শকে বাস্তবায়িত করার পন্থাও অনুধাবন করতে হবে। সময় এসেছে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে ধর্মনিরপেক্ষ, ঐক্যবদ্ধ ও আদর্শ ভারতবর্ষ গড়ে তোলার যেখানে থাকবে না কোনও ধর্মবিদ্বেষ, থাকবে না কোনও জাতিভেদ, কোনও বর্ণবিদ্বেষ, কোনও লিঙ্গবৈষম্য। তবেই আমাদের মহান ভারতবর্ষ জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভের দাবীদাররূপে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে পারবে, যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখতেন স্বামী বিবেকানন্দ, যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখতেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। তাই আমাদের সকলের কর্তব্য হল মনের সমস্ত মলিনতা দূর করে বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই বানী স্মরণ করা -

“অস্তো মা সদাশ্রম্য তমসো মা জ্যোতির্গম্য মতোমার্মৃতং গময়েতি।”^{xxviii}

অর্থাৎ, অসৎ হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত্তে লইয়া যাও।

Reference:

- i. ধর্মদর্শন, ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, বুক সিভিকিট প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি, ২০১৫, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১
- ii. মহাভারত সারানুবাদ, বসু, রাজশেখর, দেবালয় লাইব্রেরী, জুলাই, ২০১৫, কল-৯, পৃ. ২৪
- iii. নীতি, যুক্তি ও ধর্ম, মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, অক্টোবর, ২০১৪, কল-৪, পৃ. ৩৯
- iv. <https://oldsite.pup.ac.in>
- v. সাম্মানিক নীতিবিদ্যা, ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, বুক সিভিকিট প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি, ২০১৩, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৫৯
- vi. ভারতীয় দর্শন, বাগচী, দীপক কুমার, প্রগতিশীল প্রকাশক, সেপ্টেম্বর, ২০১০, কল-৯, পৃ. ২৩
- vii. পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, বুক সিভিকিট প্রাইভেট লিমিটেড, আগস্ট, ২০১৮, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৪১৩-৪১৪
- viii. উপনিষদ গ্রন্থাবলী, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (২।৫), স্বামী বিশ্বনাথানন্দ উদ্বোধন কার্যালয়, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, কল-৩, পৃ. ৩৭৬
- ix. ভারতীয় দর্শন, বাগচী, দীপক কুমার, প্রগতিশীল প্রকাশক, সেপ্টেম্বর, ২০১০, কল-৯, পৃ. ২৯৯
- x. ধর্ম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৪১
- xi. শ্রীগীতা (৪।১৩), ঘোষ, জগদীশ চন্দ্র, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, মার্চ, ২০১৮, কল-৭৩, পৃ. ১৪৪
- xii. উপনিষদ গ্রন্থাবলী, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, ছান্দোগ্য উপনিষদ ৪।২; স্বামী বিশ্বনাথানন্দ উদ্বোধন কার্যালয়, এপ্রিল, ২০১৫, কল-৩, পৃ. ২১৪-২১৫
- xiii. বাল্মীকির রাম ও রামায়ণ, ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, অক্টোবর, ২০১২, কল-৪, পৃ. ১৩
- xiv. মহাভারত সারানুবাদ, বসু, রাজশেখর, দেবালয় লাইব্রেরী, জুলাই, ২০১৫, কল-৯, পৃ. ২৪
- xv. মানব অস্তিত্ব ও মূল্যবোধের তাৎপর্য, ভট্টাচার্য, সুস্মিতা, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০২২, কল-৭৩, পৃ. ১২
- xvi. তদেব, পৃ. ২০
- xvii. মনুসংহিতা (১।৩১), বন্দোপাধ্যায়, মানবেন্দু, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, মার্চ, ২০০৩, কল-৬, পৃ. ২১৪
- xviii. তদেব পৃ. ২১৪
- xix. গোরা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, পৃ. ৩১৯
- xx. গীতবিতান-পূজা ১৩২, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাঞ্চজন্য, ২০১১, কল-৯, পৃ. ৪৪
- xxi. ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা, ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, বুক সিভিকিট প্রাইভেট লিমিটেড, ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, কল-৭৩, পৃ. ১
- xxii. শ্রীগীতা (২।৪৭), ঘোষ, জগদীশ চন্দ্র, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, মার্চ, ২০১৮, কল-৭৩, পৃ. ৫৭
- xxiii. মনুসংহিতা (৩।৫৫), বন্দোপাধ্যায়, মানবেন্দু, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, মার্চ, ২০০৩, কল-৬, পৃ. ৭৩
- xxiv. তদেব, (৯।১২), পৃ. ৮৯৪
- xxv. উপনিষদ গ্রন্থাবলী, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ২।৪; স্বামী বিশ্বনাথানন্দ উদ্বোধন কার্যালয়, জুন, ২০১৪, কল-৩, পৃ. ১৫৭-১৫৮
- xxvi. তদেব, পৃ. ২২৭-২২৮
- xxvii. জাতব্যবস্থার বিলুপ্তি, অনুবাদক, সিকদার, রণজিতকুমার, আশ্বেদকর প্রকাশনী, মার্চ, ২০০৭, কল-১৫২, পৃ. ৪৫-৪৬
- xxviii. উপনিষদ গ্রন্থাবলী, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত বৃহদারণ্যক উপনিষদ (১/৩/২৮), স্বামী বিশ্বনাথানন্দ উদ্বোধন কার্যালয়, জুন, ২০১৪, কল-৩, পৃ. ৫১